১০

জার্মান আদর্শবাদ : ইম্যানুয়েল কান্ট, জোহান ফিক্‌টে ও ভিলহেল্ম ভন হুমবোল্ড

[GERMAN IDEALISM : IMMANUEL KANT, JOHANN FICHTE AND WILHELM VON HUMBOLDT]

"There was one group of nineteenth century political thinkers whose doctrines few understood at the time and few really understand today, but whose influence on modern political thought has been enormous. These were the metaphysical idealists."

—Chester Maxey : *Political Philosophies*

"Never has a system of thought so dominated an epoch as the philosophy of Immanuel Kant dominated the thought of nineteenth century."

—Will Durant : *Story of Philosophy*

আলোচনা সংকেত : ভূমিকা—ইম্যানুয়েল কান্ট—কান্ট-এর রাজনীতি চিন্তা—রাষ্ট্র, আইন ও অন্যান্য রাজনৈতিক প্রশ্নে কান্ট—জোহান ফিক্‌টে—ভিলহেল্ম ভন হুমবোল্ড।

ভূমিকা (Introduction) : অষ্টাদশ শতাব্দীতে জার্মান রাষ্ট্র ছিল অনেকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্র নিয়ে গড়া পশ্চাৎপদ এক সামন্ততান্ত্রিক দেশ। এই সব দেশগুলির মধ্যে অস্ট্রিয়া আর প্রুশিয়া ছিল সবচেয়ে বড়ো এবং অন্যদেশগুলির মধ্যে ছিল ব্যাভেরিয়া, হ্যানোভার, স্যাক্সনি, উরটেমবার্গ প্রভৃতি। এ ছাড়া ছিল উন্মুক্ত শহর (Free cities)। প্রতিটি রাষ্ট্রেরই ছিল স্বাধীন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, আর্থব্যবস্থা এবং একান্ত নিজস্ব শাসন পদ্ধতি। ভূমিদাস প্রথা, সামন্ততান্ত্রিক স্বেচ্ছাচার, প্রতিক্রিয়াশীল শাসন, গণ্যমান্য রাজন্যবর্গের আধিপত্য এগুলিই ছিল এইসব রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। স্বভাবতই জনসাধারণের মধ্যে ক্ষোভ ছিল, কিন্তু তার বহিঃপ্রকাশ তেমনভাবে ঘটতে পারেনি। সামন্ত্রতান্ত্রিক কর্তৃত্ব ও রাজন্যবর্গের আধিপত্যের বিরুদ্ধে চাপা ক্ষোভ যখন জমা হচ্ছে তখন সমস্ত বিশ্ব তথা ইউরোপের নজর ফ্রান্সের দিকে। ফরাসি বিপ্লব জাগিয়ে তুলল জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের এক তরঙ্গ। রাজনীতি ও সমাজ শাসনে অভিজাত শ্রেণি ও রাজন্যবর্গের একচেটিয়া অধিকার ও প্রভুত্ব চিরকাল থাকতে পারে না; জনসাধারণের স্বার্থে, হিতার্থে, সম্মতি নিয়ে শাসন পরিচালনা হওয়া প্রয়োজন—ফরাসি বিপ্লবের এই শিক্ষা সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ল। মানুষের মনকে বিশেষভাবে নাড়া দিল ফরাসি বিপ্লবের উদার রাজনৈতিক মতবাদ ও বিপ্লবী চেতনা। এই মতবাদ ও চেতনা জার্মানির মানুষের মনকেও নাড়া দিয়ে গেল। কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা, অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে তারাও প্রতিবাদমুখর হতে শুরু করল।

বাস্তিল দুর্গের পতনের কিছুকাল আগেই জার্মানিতে ফ্রেডেরিক-এর শাসনের অবসান ঘটেছে। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব থেকে শিক্ষা নিয়ে এ দেশের শাসকরাও শাসন কর্তৃত্বের রাশ হালকা করতে চাইলেন, সামন্ততান্ত্রিক অব্যবস্থা, জবরদস্তি ও অপদার্থতার হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য, জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের জোয়ারে জনসাধারণকে জাগিয়ে তোলার জন্য জনগণকে তাদের নিজেদের শাসনতন্ত্র প্রদানের অধিকার দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন তাঁরা। চার্লস অগাস্টাস-এর যুগে জার্মানিতে এক নতুন বৌদ্ধিক উপলব্ধির সূচনা হল। জগৎ, জীবন, রাজনীতি সম্পর্কে এক নতুন বোধ ও বুদ্ধির প্রকাশ ঘটল। অগাস্টাস-এর যুগেই জার্মানিতে আবির্ভূত হয়েছেন সাহিত্য ও দর্শনের প্রগতিশীল চিন্তানায়কেরা। গ্যেটে, কান্ট, ফিক্‌টে, হেগেল প্রমুখ একে একে এলেন তাঁদের নতুন সৃষ্টি নিয়ে। মাত্র দু-দশকের মধ্যে জার্মানি সাহিত্য, দর্শন ও রাজনীতির জগতে যা সৃষ্টি করেছে এক শতাব্দীর দীর্ঘ সাধনায় ইউরোপের অন্য দেশগুলি তা লাভ করেনি। রেইনহোল্ড অ্যারিস (Reinhold Aris) তাঁর *'History of Political Thought in Germany'* (1789-1815) গ্রন্থে লিখেছেন, "It was as if Germany had suddenly wakened from a deep sleep and had endeavoured to make up for lost time, working with immense and accumulated energy."[১]

রাষ্ট্রতত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলে জার্মানি যে তেমন একটা মৌলিক সৃষ্টির জোগান দিতে পেরেছে তা বলা যাবে না। কারণ, অষ্টাদশ শতাব্দীর জার্মান রাষ্ট্রদর্শন ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সেরই অনুকরণ। বরং বলা যেতে পারে ফ্রান্স বা ইংল্যান্ড যখন রাষ্ট্রতত্ত্ব ও শাসননীতি নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষায় ব্যস্ত তখন জার্মানি অতীতের ভাবধারা ও আদর্শকে নিয়েই পড়ে আছে। ফরাসি বিপ্লবের আগে পর্যন্ত জার্মান রাষ্ট্রদর্শন একরকম প্রচলিত পথেই চলেছে। বিদেশের মাটিতে পুষ্ট জার্মান রাষ্ট্রদর্শন বিপ্লবের আগে পর্যন্ত জার্মানির প্রয়োজন পরিস্থিতি মতো বেড়ে উঠতে পারেনি। এর প্রধান কারণ জার্মানির ধর্মীয় ও ভৌগোলিক বিভাগ ও বিচ্ছিন্নতা। ছোটো-বড়ো প্রায় শতাধিক রাষ্ট্র নিজেদের মধ্যে বিবাদ ও কলহে মত্ত থেকেছে, জার্মানির উপর অধিকার নিয়ে প্রুশিয়া ও অস্ট্রিয়া প্রতিযোগিতা, যুদ্ধে লিপ্ত থেকেছে, দেশে উদারনৈতিক মতবাদ ও বিপ্লব পরিহারের জন্য শাসককুল কূটনীতি, ষড়যন্ত্র এবং মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়েছেন, স্বৈরতন্ত্রকে বজায় রাখার জন্য, গণজাগরণকে স্তব্ধ করার জন্য সুযোগসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি নিতেও দ্বিধা করেননি। Aris লিখেছেন-'For every German it is a sad thought that whereas England under the influence of the spiritual movement emanating from the Reformation could powerfully develop her social and political life, Germany, the land of Reformation continuously degenerated."[২] এ কথা অবশ্য স্বীকার্য সংস্কার আন্দোলনের সূচনা জার্মানিতে হলেও জার্মানি এই আন্দোলনের পৃষ্টপোষকতার সুযোগ নিতে পারেনি, যতটা পেরেছে ইংল্যান্ড বা ফ্রান্স। ফ্রান্স তো বিপ্লব নিজেই দেখেছে, বিপ্লবের বাণী প্রচার করেছে। ব্রিটেন বিপ্লবের মর্ম উপলব্ধি করেছে, সংস্কারের পথে গিয়েছে। জার্মানি বিপ্লবের পথে যাওয়া বা বিপ্লবকে সমর্থন করা তো দূরের কথা, বিপ্লব ও গণতন্ত্রের চিহ্নটুকুও ইউরোপ থেকে নিশ্চিহ্ন করার কাজে ব্যস্ত ছিল। পরিবর্তন বিমুখতা ও পুরোনো সামন্ততান্ত্রিক রাজরাজরার শাসন বজায় রাখতেই জার্মানি তৎপর হয়েছে।

কেন জার্মানির এই পরিবর্তন বিমুখতা? বলা হয়, জার্মানির জাতীয় চরিত্রই ছিল বিপ্লব ও পরিবর্তনের বিরোধী। কেউ কেউ বলেন, ফ্রান্সের মতো জার্মানিতে বিপ্লবের সামাজিক আর্থিক পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেছেন জার্মানির আর্থিক অবস্থা তার পাশের রাষ্ট্রের তুলনায় শোচনীয় ছিল না। দারিদ্র্য, অন্যায়, অত্যাচার বা শোষণও এ দেশে তেমনভাবে মাথা তুলে দাঁড়ায়নি। সামাজিক-আর্থিক পরিস্থিতি নয়, আসলে জার্মানিতে পরিবর্তন বা বিপ্লবের মানসিকতাই গড়ে ওঠেনি। ফ্রান্সে জনমনে জাতীয় পরিস্থিতি ও সমস্যা সম্পর্কে যে চেতনার বিকাশ হয়েছিল জার্মানিতে তা হয়নি। পুরোনো ব্যবস্থা সম্পর্কে কোনো তীব্র প্রতিক্রিয়া বা প্রতিকূল চেতনা এ দেশে জমাট বাঁধেনি। ইংল্যান্ড বা ফ্রান্সে মধ্যবিত্ত বা উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণি শহরকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করেছিল, রাজতন্ত্রকে তাদের পক্ষে আনার জন্য যেভাবে সংগঠিত হয়েছিল, জার্মানিতে তেমনটাও হয়নি। রাজা ও সম্ভ্রান্তশ্রেণি বরাবরই বিপ্লব বিরোধী ছিলেন। সরকারি কর্মচারী ও উচ্চ পদাধিকারীরা এদের পথই অনুসরণ করেছেন। আর সাধারণ জনসাধারণ বা কৃষকশ্রেণি তো রাজনৈতিকভাবে সংগঠিতই হতে পারেনি।

তবে এরই মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা, মানবমুখী চেতনা জাগ্রত হয়েছে কোনো কোনো ব্যক্তির মধ্যে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোনো বিপ্লবী রাজনৈতিক চেতনা নিয়ে বা জাতীয় চেতনা নিয়ে পরিবর্তনের প্রশ্নকে বিচার করেননি। এঁরা সাধারণ মানবিক প্রশ্নকে সামনে রেখেই তাঁদের রাজনৈতিক দৃষ্টিকে প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন। স্বৈরতন্ত্রের আধিক্য বা অমিতাচার নিয়ে এঁদের তেমন চিন্তা ছিল না। এঁরা ভেবেছিলেন উপকারী স্বৈরতন্ত্রের (benevolent despotism) মাধ্যমেই দেশ ও জাতির সুখ ও শান্তি আসবে। জনকল্যাণের আদর্শে রাজা শাসন পরিচালনা করলেই গণতন্ত্র ও প্রগতির পথ প্রতিষ্ঠিত হবে।

অবশ্য এইসব পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণির মধ্যেই দু-চারজনকে পাওয়া গেল যাঁরা ফরাসি বিপ্লবের ভাবধারায় জার্মানির জাগরণ কামনা করলেন। রাজা ও সম্ভ্রান্তবর্গের সুবিধাবাদকে এঁরা ধিক্কার জানালেন, জনগণের স্বাধীনতার পক্ষে সোচ্চার হলেন, গণতন্ত্রের পথে শাসন সংস্কার ও পরিচালনার দাবি জানালেন। ফরস্টার-এর মতো ঐতিহাসিক, কান্ট-এর মতো মানবতাবাদী, ফিক্‌টের মতো সংস্কারক এই গোষ্ঠীর মধ্যেই পড়েন। সরাসরি বিপ্লবী ভাবনাকে প্রচার করা এঁদের লক্ষ ছিল না। এঁদের পরিচয় ছিল 'radical cosmopolitan' বা 'radical republican' হিসাবে। বিপ্লবের আলোকবর্তিকা এঁদের পথ দেখিয়েছে, বিপ্লব থেকে এঁরা শিক্ষা নিয়েছেন, বিপ্লবের স্বাদেশিকতা ও অন্যান্য গঠনমূলক কার্যকলাপ, মানবিক ধারণা জার্মানির ক্ষেত্রে কতটা সফলভাবে ব্যবহার করা যায় এ কথা এঁরা ভেবেছেন। কেউ কেউ বিপ্লবী ধারণার চেয়ে সৌন্দর্য ও সুরুচির, সাংস্কৃতিক বিকাশের এক উদার ভাবনাকে প্রকাশ করলেন। এঁদের অন্যতম প্রতিনিধি হলেন হুমবোল্ড (Wilhelm von. Humboldt)। বিপ্লব ও সংস্কারের চেতনায় জার্মানির মানুষকে উদ্‌বুদ্ধ করতে চেয়েছেন আর যেসব দার্শনিক এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মোসার (Moser), ব্রান্ডেস (Brandes) ও রেবার্গ (Rehberg)। রোমান্টিক ভাবধারা বা অভিজ্ঞতাবাদী চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী চেতনার প্রতি সহানুভূতি বা আকর্ষণ ছিল এই লেখকদের মধ্যে গভীর।

ইম্যানুয়েল কান্ট
(Immanuel Kant)

কান্ট-এর দার্শনিক ভাবনা (Kant's Philosophic Thinking)

ইম্যানুয়েল কান্টকে (১৭২৪-১৮০৪ খ্রি.) ধ্রুপদি জার্মান দর্শন তথা জার্মান আদর্শবাদের জনক বলা হয়। প্রুশিয়ার কনিসবার্গ অঞ্চলের অধিবাসী, পেশায় অধ্যাপক, শান্ত, সংযত এই মানুষটি সারা জীবনই নৈতিকতা, স্বাধীনতা ও সমতার পক্ষে লড়াই করেছেন। ফরাসি বিপ্লবের আলো জার্মানিতেও ছড়িয়ে পড়ুক, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে উদারতা ও শুভবুদ্ধি জাগ্রত হোক, সমাজ ও মানুষের জীবনে চিরস্থায়ী শান্তি আসুক কান্ট মনেপ্রাণে এ কথাই ভাবতেন। ধর্মপ্রাণা মাতার প্রভাবে প্রথম জীবনে ধর্মের প্রতি তাঁর প্রবল আনুগত্য থাকলেও পরবর্তীকালে ধর্মকে তেমন উদার দৃষ্টি নিয়ে তিনি দেখেননি, ধর্মতত্ত্বের অনেক ধারণাকেই তিনি অগ্রাহ্য করেছেন। সমকালের রাজধর্ম ও শাসননীতির প্রতিও তাঁর ছিল গভীর অবিশ্বাস। এই সন্দেহ ও অবিশ্বাসের জন্য তাঁকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের বিষনজরে পড়তে হয়েছে, ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে চরম মূল্য দিতে হয়েছে।

১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দে কনিসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসাবে কান্ট-এর কর্মজীবনে প্রবেশ। এরপর থেকে একরকম লেখাপড়া ও শিক্ষাদানের মধ্যেই কেটে গেছে তাঁর বাকি জীবন। লেখার চেয়ে পড়া ও পড়ানোয় সুনাম অর্জন করেছেন তিনি বেশি। অধিবিদ্যা, তর্কবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূবিদ্যা, পুরাতত্ত্ব, মানব জাতিতত্ত্ব সবকিছুই আগ্রহের সঙ্গে পড়েছেন ও জেনেছেন তিনি। চিন্তার মৌলিকতা হয়তো তেমন ছিল না, কিন্তু স্বচ্ছতা ছিল। তাঁকে আবিষ্কারক হয়তো বলা যাবে না, কিন্তু প্রতিটি প্রচলিত বা বিরুদ্ধ ধারণাকে নিজের মতো করে সাজিয়ে-গুছিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন তিনি, তাদের মধ্যে সংশ্লেষ ও সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন। কান্ট-এর সবচেয়ে বড়ো পরিচয় তাঁর শৃঙ্খলা। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন, তেমনি চিন্তায় এক অদ্ভুত শৃঙ্খলা মেনে চলেছেন তিনি। তাঁর জীবন-শৃঙ্খলার কথা বলতে গিয়ে জীবনীকার হাইনে (Heine) লিখেছেন— "Kant's life passed like most regular of regular verbs. Rising, coffee drinking, writing,

lecturing, dining, walking each had its set time."[৩] ছোটোখাটো চেহারার কান্ট যখন নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর ছাই রঙের কোট পরে ছাতা হাতে লিনডেন অ্যাভিনিউ-এর সুদৃশ্য বৃক্ষরাজির পাশ দিয়ে নীরবে হেঁটে যান, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা কোনো সময়েই যখন তাঁর এই প্রাত্যহিক ভ্রমণে ছেদ পড়ে না, তিনি যখন কথা বলেন, শ্রেণিকক্ষে বক্তৃতা দেন তখন সবকিছুর মধ্যেই ধরা পড়ে এক অপূর্ব শৃঙ্খলা। তাঁর বোধ, বুদ্ধি ও শৃঙ্খলার মধ্যে লক্ষ করা যায় প্রজ্ঞার এক প্রতীকী প্রকাশ। ধীর, স্থিতধী, সংযত, শৃঙ্খলাপরায়ণ দার্শনিক কান্ট একইভাগে জগৎ, জীবন ও রাজনীতির বিকাশের মধ্যে দেখতে চেয়েছেন শৃঙ্খলার অনুবর্তন।

কান্ট-এর দর্শন ভাবনার মূলে ছিল তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান বা অনুভূতি। তাঁর চোখে আদর্শই সত্য এবং কোনো বাধা বা অভিজ্ঞতা দিয়ে একে বোঝা যাবে না। এর অর্থ এই নয় যে তিনি অভিজ্ঞতাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁর *'Critique of Pure Reason'*. *'Critique of the Practical Reason'* গ্রন্থ দুটিতে কান্ট তাঁর দার্শনিক ভাবনাকে প্রকাশ করেছেন। প্রথম গ্রন্থটিকে যুগান্তকারী রচনা বলে দার্শনিক মহলে সম্মান জানানো হয়েছে। গ্রন্থটিতে কান্ট সোজা কথায় যা বলতে চেয়েছেন তা হল :

* শুদ্ধ যুক্তি হল সেই জ্ঞান যা আমাদের বুদ্ধির অগোচরে এবং অভিজ্ঞতার বাইরে। এই জ্ঞান মনের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি ও কাঠামো অনুসারেই আমাদের মধ্যে বিরাজ করে।
* সত্যতা সেই পরম জ্ঞান, অভিজ্ঞতা দিয়ে যাকে বোঝা যাবে না। সত্য অভিজ্ঞতার ঊর্ধ্বে। অভিজ্ঞ বুদ্ধি দিয়ে বোঝার আগেই সত্য এসে হাজির হয়। সত্য সবার উপরে।
* জ্ঞান অতীন্দ্রিয়, বস্তু নির্ভর নয়। এ হল ধারণা বা সূত্র যার মাধ্যমে অস্তিত্বের পর্যায়গুলিকে চিন্তার মধ্যে আনা যায়। দুভাবে এটা সম্ভব - অনুভূতিকে সমন্বিত করে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপলব্ধির স্তরে আনা এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপলব্ধিকে সমন্বিত করে ধারণার আকারে আনা ও চিন্তার মধ্যে যুক্ত করা।
* অসংগঠিত উত্তেজনা অনুভূতির আকার নেয়। অসংগঠিত অনুভূতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপলব্ধিতে রূপান্তরিত হয়। ধারণা হল সংগঠিত উপলব্ধি। সংগঠিত ধারণাই জ্ঞান। সংগঠিত জ্ঞানই বিজ্ঞান। আর সংগঠিত জীবন হল মহত্ত্ব (wisdom)। প্রতিটিই শৃঙ্খলার উচ্চতর মান, আনুক্রমিক এবং ঐক্যের সূচক।

কান্ট বলেন, আমরা, আমাদের ব্যক্তিত্ব, আমাদের মন এই উচ্চতর মান, অনুক্রম ও ঐক্যকে চায়। এই বিশ্ব আছে, শৃঙ্খলা আছে যে চিন্তা এই বিশ্ব ও শৃঙ্খলার আদর্শকে প্রকাশ করে তারই জন্য। এই চিন্তা সংগঠিত বলেই বিশ্ব সংগঠিত ও সুশৃঙ্খল। কান্ট-এর চোখে চিন্তা বা আদর্শই বড়ো, বস্তু বড়ো নয়। বস্তু আছে এ ছাড়া এর সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে আর কিছু আমরা জানি না। কান্ট-এর কথায় "We know the object as transformed into idea; what it is before being so transformed we cannot know."[৪]

কান্ট-এর দর্শনের মূলে আছে ধর্মের প্রতি বিরাগ ও নীতির প্রতি অনুরাগ। তাঁর *'The Critique of Practical Reson'* বইতে ধর্মতত্ত্বকে তিনি নিরাপদ মনে করেননি বরং তাকে প্রত্যাখ্যান এবং প্রয়োজনে ধ্বংস করার কথা বলেন। তবে যে ধর্মের বনিয়াদ নৈতিকতা তাকে তিনি আহ্বান করেন। তিনি বলেন, "We must find a universal and necessary ethic; a priori principles of morals as absolute and certain as Mathematics."[৫] তাঁর মতে নৈতিক উপলব্ধি স্বাভাবিক, সহজাত, অভিজ্ঞতা সঞ্জাত নয়। কান্ট নৈতিক আইনের জয় ঘোষণা করেছেন এবং বলেছেন, "it is the categorical imperative in us, the unconditional command of our conscience. . . ." আমরা ভালো কাজ করি ভালো ফলের আশা করে নয় বা তা মহৎ এই ভেবে নয়। আমাদের বিবেকের তাড়নার, কর্তব্যের টানেই তা করি। নৈতিক আইনকে অনুসরণ করার ইচ্ছাই আমাদের কাছে বড়ো। সুখের কথা ভেবে নয়, কর্তব্যের টানেই আমরা ভালো কাজ করি। কান্ট-এর কথায়, "Morality is not properly the doctrine of how we may make ourselves happy but how we may make ourselves worthy of happiness."[৬]

অন্যের সুখ ও নিজের পূর্ণতা, এটাই নৈতিকতা। মানবতাকে লক্ষ্য হিসাবে দেখাই হল প্রকৃত নৈতিকতা। কান্ট চেয়েছেন মানুষকে কর্তব্যে অনুপ্রাণিত করতে। এইভাবেই তৈরি হবে মানুষের আদর্শ সমাজ—এখানে 'duty is above beauty, morality is above happiness', কর্তব্যই মানুষকে পশুর থেকে আলাদা করে এবং ঈশ্বরের কাছাকাছি নিয়ে যায়।

কান্ট-এর কাছে ধর্ম যে একেবারে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে তা নয়। প্রায় সত্তর বছর বয়সে তিনি লিখেছেন—'Religion within the limits of Pure Reason.' তিনি যে ধর্মের কথা বলেন তা মানবধর্ম। অতি প্রাকৃতিক নক্‌শা বা পরিকল্পনায় যেখানে মিল আছে, ঐক্য আছে তা দেখে তিনি আনন্দ পান। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যের বিশৃঙ্খলা ও অপব্যয়, দুঃখ ও মৃত্যু তাকে নিরানন্দ করে। যে ধর্মতাত্ত্বিক প্রকৃতির পরিকল্পনায় পরিণামদর্শিতা, জীবের প্রতি ঈশ্বরের যত্ন দেখেন সেই ধর্মতাত্ত্বিকের সঙ্গে কান্ট একমত নন। ধর্ম যে তাত্ত্বিক যুক্তির তর্ক মেনে প্রতিষ্ঠিত হবে না, প্রতিষ্ঠিত হবে নৈতিকতার বাস্তব যুক্তির উপর এ কথা বলতে তাঁর দ্বিধা নেই। ধর্ম, ধর্মপুস্তক, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সবকিছুর তাৎপর্য নির্ধারিত হবে নৈতিকতার মূল্যে। কান্ট-এর কথায় সেটাই হল প্রকৃত চার্চ বা ধর্ম প্রতিষ্ঠান যেখানে মানুষ তাদের বিভিন্নতা সত্ত্বেও মিলিত হয়, ঐক্যবদ্ধ হয় সাধারণ নৈতিক আইনের প্রতি অনুগত হয়ে। কান্ট-এর দৃঢ় বিশ্বাস "Christ has brought the Kingdom of God nearer to earth; but he has been misunderstood; and in place of God's Kingdom the Kingdom of the priest has been established among us."[৭] উপাসনা ও উপাচার মহৎ জীবনের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। ধর্ম মানুষকে এক না করে হাজার ধর্মমতে বিভক্ত করে, স্তুতি ও তোষামোদের মাধ্যমে ঈশ্বরকে খুশি করার প্রচেষ্টা চালায়, অলৌকিক পথ ও পন্থায় বিশ্বাস করতে মানুষকে প্ররোচিত করে।

কান্ট সম্ভবত তাঁর সময়ে প্রুশিয়ার রাজতান্ত্রিক শাসনে নৈতিকতার অভাব লক্ষ করেছিলেন। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে মহান ফ্রেডেরিক গত হয়েছেন। সিংহাসনে বসেছেন দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক উইলিয়াম। উইলিয়াম পূর্বের শাসক মহান ফ্রেডেরিক-এর উদার শাসন ও নীতিকে অগ্রাহ্য করে স্বৈরী শাসন চালাচ্ছেন এবং ফরাসি বিপ্লবী ভাবধারার বিরুদ্ধাচরণ করছেন এটা কান্ট-এর ভালো লাগেনি। ফ্রেডেরিক আমলের শিক্ষামন্ত্রী উদারভাবাপন্ন জেডলিচকে বরখাস্ত করে উইলিয়াম তার স্থানে বসিয়েছেন উলনার-এর মতো বিশ্বাসঘাতক ও ষড়যন্ত্রকারী পুরোহিতকে। উলনার-এর প্রভাব ও প্রশ্রয়ে রাজা উইলিয়াম প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাসকে বাধ্যতামূলক করলেন। ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে লুথারীয় প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমতের বিরোধিতা করে কোনো বিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো শিক্ষা দেওয়া চলবে না, উলনার এরকম একটি আদেশ জারি করলেন। প্রচলিত ধর্মমতবিরোধী লেখার উপরও বিবাচন ও নিষেধাজ্ঞা জারি হল। কান্ট-এর ধর্মীয় চিন্তার উপরেও নিষেধাজ্ঞা জারি হল। কান্ট প্রুশিয়ার বাইরে জেনা থেকে তাঁর পুস্তক প্রকাশ করলেন। সমকালে এই ধরনের সাহসী উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা আমাদের বিস্মিত করে। পুস্তকটি প্রকাশের জন্য প্রুশিয়ার সরকার ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে সতর্ক করে দেয় এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের লেখা থেকে বিরত থাকতে বলে। উত্তরে কান্ট বলেন, ধর্মের ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব মত ও বিবেচনা মতো চলার অধিকার প্রতিটি বুদ্ধিজীবী মানুষের থাকতেই পারে, তবে পরবর্তীকালে তিনি এ-ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেই চলবেন। সত্তর বছরের একজন বৃদ্ধ যিনি তাঁর বলিষ্ঠ মতামত মানুষকে পূর্বেই জানাতে পেরেছেন, তাঁর পক্ষে এর বেশি আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না।

কান্ট-এর রাজনীতি চিন্তা (Political Thought of Kant)

কান্ট যে শুধুমাত্র ধর্মীয় অনাচার বা প্রভুত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন তা নয়। জার্মান সরকার কান্ট-এর মধ্যে আবিষ্কার করেছে একজন রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদীকে। ফ্রেডেরিক উইলিয়াম জার্মানিতে ক্ষমতায় আসীন হবার তিন বছর পর ফ্রান্সে ঘটে গেল বিপ্লব। রাজতান্ত্রিক ও সামন্ততান্ত্রিক প্রভুত্বের আসন টলে গেল। রাজতন্ত্রের সংকটে অন্য সকলে যখন রাজার ক্ষমতার সমর্থনে এগিয়ে এল কান্ট তখন বিপ্লবকে আনন্দের সঙ্গে স্বাগত জানালেন। আনন্দাশ্রু নিয়ে তিনি বন্ধুদের কাছে জানালেন :

"Now I can say like Simeon, 'Lord, let now Thy servant depart in peace; for mine eyes have seen Thy salvation."[৮]

ফরাসি বিপ্লবের মধ্যে কান্ট প্রত্যক্ষ করেছেন ঈশ্বরের ছায়া, মানুষের পরিত্রাণ। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য। 'The Natural Principle of the Political order considered in connection with the idea of a Universal Cosmopolitical History." শীর্ষক প্রবন্ধে কান্ট যে রাজনৈতিক অবস্থান নিয়েছেন তাতে তাঁর বক্তব্যের বিপ্লবী চরিত্র ধরা পড়ে। মৌলিক কোনো তত্ত্ব তিনি দেননি বটে, কিন্তু অপরের ধারণাকেই এতটা প্রাঞ্জল ও সোজাসুজিভাবে উপস্থিত করার কৃতিত্ব খুব কম লোকেরই আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের প্রচলিত রাজনৈতিক দর্শনকেই তিনি তাঁর সমালোচনামূলক দর্শনে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তাঁর হাত ধরেই জার্মানিতে ফিরে এলেন মঁতেস্কু ও রুশো। নিজের ভাষায় ও যুক্তিতে রুশোর ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন তিনি। সরকার বিষয়ে তাঁর মতামত অনেকটাই মঁতেস্কুর অনুগামী। ডানিং লিখেছেন—"Kant's admiration for these two French writers was deep and unconcealed, and his incorporation of their ideas into his system was destined to promote greatly the influence of liberalism when the Kantian system got a firm hold on intellectual Germany."[৯]

কান্ট তাঁর রাজনৈতিক ভাবধারা প্রধানত প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁর *'Metaphysical First Principles of the Theory of Law* (1796)' গ্রন্থে এবং এর একবছর আগে প্রকাশিত তাঁর *'For Perpetual Peace'* পুস্তিকায়।

কান্ট কিন্তু রুশোর ধারণা মতো অগ্রসর হননি। হব্‌স-এর মতো দুঃখ নিয়ে নয়, তিনি সরলভাবেই স্বীকার করেছেন মানুষের বিবাদ ও কলহের কথা। মানুষের এই প্রবণতা অত্যন্ত স্বাভাবিক। পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্বে, বিবাদে আছে জীবনের সুপ্ত বিকাশের শর্ত, প্রগতির অপরিহার্য উপাদান। মানুষ যদি প্রথম থেকেই সামাজিক হয় তাহলে তো সবকিছু থমকে দাঁড়াবে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও প্রতিযোগিতা মানুষের বাঁচার ও বিকাশের শর্ত। *'Perpetual Peace'* পুস্তিকায় তিনি লিখেছেন, অসামাজিক বৃত্তি না থাকলে মানুষ তো পার্বত্য অঞ্চলের নেকড়ের মতো সম্পূর্ণ বাঁধাধরা পরস্পর নির্ভর জীবনের অধীন হয়ে পড়বে। তাদের প্রতিভা সুপ্ত অবস্থায় থেকে যাবে। প্রকৃতির অসামাজিক প্রবণতাকে তিনি ধন্যবাদ জানান, হিংসা ও অহংকারকে, ক্ষমতা ও সম্পত্তির উপর অধিকারবোধকে তিনি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বলেই মনে করেন। তাঁর মতে মানুষ সহযোগিতা বা ঐক্য চাইলেই তো হবে না, কীসে তার সৃষ্টির ভালো হবে তা প্রকৃতিই ভালো বোঝে। প্রকৃতিই চায় মানুষ তার স্বাভাবিক সামর্থ্যকে বিকশিত করুক। কান্ট-এর মতে বাঁচার লড়াই খারাপ কিছু নয়। তবে ধীরে ধীরে মানুষকে নিয়ম ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনতে হবে। তাঁর কথায়,

"The history of the human race, viewed as a whole may be regarded as the realisation of a hidden plan of nature to bring about a political constitution, internally and externally perfect, as the only state in which all the capacities implanted by her in mankind can be fully developed."[১০]

শান্তির উপর কান্ট-এর প্রস্তাব বা ধারণা রাষ্ট্রচিন্তার বিকাশে অমূল্য প্রভাব ফেলেছে। অষ্টাদশ শতকে শান্তি ও মানবিকতার প্রশ্নে কান্ট যেরকম ভাবনাচিন্তা করেছেন, আজকের এই বিংশ শতকেও আমরা সেইভাবে ভাবনাচিন্তা করি বলে মনে হয় না। অ্যারিস কান্ট-এর 'Perpetual Peace'-এর মধ্যে দেখেছেন "the philosophic rules for a league of nations as the indispensable presupposition for a lasting peace."[১১] কান্ট-এর অন্য সমস্ত রাজনৈতিক লেখার মধ্যে এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং জার্মানির বাইরে রচনাটি বহুল জনপ্রিয়। কান্ট বিশ্বাস করেন ইতিহাসের গতি মেনেই হিংসা ও দ্বন্দ্বকে পরিহার করে মানুষ ক্রমে ক্রমে চিরস্থায়ী শান্তির পথে অগ্রসর হবে। মানবতার প্রবক্তা, শান্তির অগ্রদূত কান্ট তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের প্রধান লক্ষ্য হিসাবে শান্তির এলাকা প্রসারিত করার কথা বলেন। মানুষের মতো দেশগুলোকে তিনি আহ্বান করেন তাদের বন্য প্রকৃতি বর্জন করে শান্তির জন্য চুক্তি করতে। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কান্ট দুটি ধারণার প্রতি গুরুত্ব দেন :

১. সমস্ত দেশের স্থায়ী যুদ্ধবাহিনীর অবসান;

২. প্রতিটি দেশের সংবিধানকে প্রজাতান্ত্রিক রূপ দান।

কান্ট দুঃখ প্রকাশ করেন, জনশিক্ষার কাজে শাসকের ব্যয় করার মতো টাকা নেই। সব টাকাই যুদ্ধের খরচে, সামরিক বাহিনীকে বহাল রাখতে ব্যয় হয়। যতদিন রাষ্ট্রের স্থায়ী যুদ্ধবাহিনী থাকবে ততোদিনই একটি রাষ্ট্র আরেকটি রাষ্ট্রকে অধীনস্থ করতে চাইবে, তার উপর প্রভুত্ব বজায় রাখতে চাইবে। রাষ্ট্রের রক্ষীবাহিনীর কাজকর্মে ও প্রতাপে শান্তির চেয়ে যুদ্ধ বেশি দামি, এটাই প্রমাণিত হয়।

কান্ট যুদ্ধের অবস্থা সৃষ্টির জন্য দায়ী করেছেন ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী প্রবণতাকে। আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকায় ইউরোপের সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রবণতাই যুদ্ধ সৃষ্টির কারণ। ভাগের লুট নিয়ে ইউরোপের চোরেদের ঝগড়া, ইউরোপের সভ্য ব্যাবসায়িক রাষ্ট্রগুলির বিদেশের মানুষদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ প্রভৃতিই চিরস্থায়ী শান্তি সৃষ্টিতে বাধা দিয়েছে। কান্ট ইউরোপের স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সাম্রাজ্যবাদী, ক্ষমতালোভী প্রবণতার নিন্দা করেছেন। যতদিন দেশের সংবিধান গণতান্ত্রিক না হচ্ছে, ইউরোপের দেশগুলির প্রলোভনকে রোধ না করা যাচ্ছে ততদিন শান্তির পথ রুদ্ধই থাকবে। **কান্ট চিরস্থায়ী শান্তির প্রথম এবং প্রধান শর্ত হিসাবে প্রজাতান্ত্রিক সংবিধানের কথা ঘোষণা করলেন।** কান্ট-এর কথায়,

> "The civil constitution of every state shall be republican, and war shall not be declared except by a plebiscite of all the citizens."[১২]

যে সংবিধানে প্রজাদের ভোটের অধিকার নেই, যেখানে শাসক রাষ্ট্রকে দখলি স্বত্ব হিসাবে মনে করে, যেখানে শাসক তাঁর ব্যক্তিগত আনন্দকে ত্যাগ করতে পারেন না, যেখানে শাসক তুচ্ছ কারণেই যুদ্ধ ঘোষণা করেন (কান্ট-এর কথায় যুদ্ধ যেন শিকারের অভিযান বা প্রমোদ) সেখানে প্রজাতন্ত্র বলে কিছু নেই। কান্ট চেয়েছেন স্বাধীন জাতিগুলিকে যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে আনতে। তাঁর কথায়, "the law of nations shall be founded on a federation of free states." কান্ট ঠিক বিশ্বরাষ্ট্রের কথা বলতে চাননি। তিনি চেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র, যেখানে প্রতিটি জাতি স্বাধীন অথচ সকলের সাধারণ সমস্যার ক্ষেত্রে তারা মিলিত সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। এর ফলে যুদ্ধ রোধ হবে, এক জাতি অন্য জাতির উপর প্রভুত্ব করার সুযোগ পাবে না। কান্ট-এর নৈতিকতায় স্বাধীনতা হল স্বাতন্ত্র্য। তাঁর মতে নৈতিক ব্যক্তি অন্যের আইনে নয়, নিজের আইনেই বাঁধা। কোনো বাহ্য লক্ষ্যসাধনের পন্থা হিসাবে মানুষ ব্যবহৃত হবে না। মানুষ নিজেই লক্ষ্যের জগতে আইনপ্রণেতা। কান্ট সেই জাতিতত্ত্বের বিরোধী যেখানে জাতিগত প্রভুত্বের কথা বলা হয়। তাঁর কাছে মানবজাতিই প্রথম এবং শেষ কথা।

কান্ট প্রজাতান্ত্রিক সংবিধানকে পছন্দ করেছেন, কারণ এই সংবিধান জাতির নৈতিক ভাবনাকে বিকশিত করতে সাহায্য করবে। এই সংবিধান জাতিকে সাংস্কৃতিক ও ভাবের আদানপ্রদান ও পারস্পরিকতার নীতিতে উদ্‌বুদ্ধ করে বৃহত্তর মানবসমাজ ও মানবজাতির কল্যাণের পথ প্রশস্ত করতে সাহায্য করবে। কান্ট বিশ্বাস করেন মানুষ যেমন হিংসা ও কলহকে কাটিয়ে উঠে স্বাভাবিক মানবিক প্রবণতা অনুসারে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে নিজেদের শান্তি ও কল্যাণের পথ খুঁজে নিয়েছে, জাতিসমূহও তেমনি শান্তির উদ্যোগে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবে। কান্ট 'Perpetual Peace' এ যে কথা বলেছেন, যে সমস্যার কথা বলেছেন, যে সমাধান সূত্র দিয়েছেন তা ভাবীকালের মানুষকে উদ্‌বুদ্ধ করেছে। সামগ্রিকতাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধবাদের বিপদ সম্পর্কে তাঁর চিন্তা বা যুক্তরাষ্ট্র, খোলা কূটনীতি, অ-হস্তক্ষেপের নীতি বিষয়ে কান্ট যা বলেছেন পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিকতা ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের বিকাশে তা বিশেষ সাহায্য করেছে। **কান্ট-এর রাজনীতি চিন্তার বড়ো আবেদন হল তাঁর আন্তর্জাতিকতাবাদ। যুদ্ধ নয় শান্তি—এটাই ছিল তাঁর বাণী।** নিজেদের মধ্যে শত্রুতা ও যুদ্ধের অবস্থা পরিহার করে, আধিপত্যবাদের ধারণাকে চূর্ণ করে সমানাধিকারের ভিত্তিতে জাতিসমূহ তাদের সম্পর্ক নির্ধারণ করবে, এটাই ছিল কান্ট-এর আন্তর্জাতিকতাবাদ। যুদ্ধের ক্ষেত্রে দস্যুতা বা লুণ্ঠন গুপ্তচরবৃত্তি, মিথ্যা গুজব, পরাজিত রাষ্ট্রের উপর যুদ্ধের ব্যয়ভার চাপানো প্রভৃতির নিন্দা করেছেন কান্ট। মানবদরদী কান্ট

বলতে চেয়েছেন যুদ্ধের বিধ্বংসী পরিণাম মানুষের পক্ষে কী হতে পারে। তাঁর আবেদন, শান্তির পথে বিবাদ মীমাংসার জন্য রাষ্ট্রগুলি নিজেদের এক সংঘ গঠন করুক, পরস্পরের অধিকার ও কর্তব্য বিষয়ে শ্রদ্ধাশীল হোক, নিজেদের শুভ বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ ঘটাক। শান্তির জন্য, মানুষের স্বাধীনতার জন্য, মানবজাতির নৈতিক প্রগতির জন্য ধর্ম নির্বিশেষে এক নাগরিক সমাজ প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতার কথা বলেছেন কান্ট। ফরাসি বিপ্লব কান্টকে ভবিষ্যৎ সমাজ বিষয়ে আশাবাদী করেছে। বিপ্লবের জয় ক্রমে ক্রমে পৃথিবীতে গণতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের জয়ে পর্যবসিত হবে, মানুষের স্বাধীনতা ও নৈতিকতার জয়ে পরিণত হবে, আন্তর্জাতিক শান্তি, শৃঙ্খলা, সহাবস্থান প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে কান্ট এ আশা করেছিলেন। কান্ট চেয়েছেন মানুষের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠা করতে, মানুষের সদগুণ ও সামর্থ্যকে বিকশিত করতে, সমানাধিকারের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং সর্বোপরি সবরকমের বৈষম্য ও সুবিধাবাদ থেকে সমাজকে রক্ষা করতে। ফরাসি বিপ্লবের মধ্যেই তিনি দেখেছেন মানুষের মুক্তি, মর্যাদা ও সমানাধিকারের সফল প্রতিফলন। ফরাসি বিপ্লব প্রসঙ্গে কান্ট-এর বলিষ্ঠ অবস্থানের কথা বলতে গিয়ে উইল ড্যুর‍্যান্ট লিখেছেন—

> "In the midst of obscurantism and reaction and the union of all monarchial Europe to crush the Revolution, he takes his stand, despite his seventy years, for the new order, for the establishment of democracy and liberty every where. Never had old age so bravely spoken with the voice of youth."[১৩]

কান্ট চেয়েছিলেন এমন এক রাজনৈতিক দর্শন প্রতিষ্ঠা করতে যা একছত্রবাদী, স্বৈরাচারী শাসনের হাত থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে পারে। সমকালের রাজনৈতিক স্বৈরাচারিতাকে তিনি মনেপ্রাণে ঘৃণা করেছেন এবং চিন্তা করেছেন কীভাবে সাধারণ মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে আলোকিত করা যায় নতুন ভাবনায়—মানবিকতা, নৈতিক মূল্যবোধের রাজনীতিতে। রাজনীতির উৎস তিনি খুঁজে পেলেন নৈতিকতায়, যে নৈতিকতা হারিয়ে গিয়েছে স্বৈরাচারী শাসনে। **মানুষকে শাসনের স্বার্থে কাজে লাগাবার নীতি পরিত্যাগ করে শাসককে মানুষের স্বার্থে, মানবিকতার স্বার্থে নিয়োজিত করতে চাইলেন তিনি।** নিউটন যেমন প্রকৃতির নিয়ম আবিষ্কার করেছেন, কান্ট তেমনি আবিষ্কার করতে চাইলেন মানুষের যুক্তিবোধ, শুভবুদ্ধির নিয়ম। সমাজের মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম তিনি খুঁজে পেলেন নীতিবিজ্ঞানে। কান্ট প্রথমেই নীতি ও আইনের পার্থক্য বিষয়ে আমাদের সচেতন করেন। যদিও এই বিভেদ রেখাটি একান্তই আনুষ্ঠানিক। **কান্ট বললেন আইনের বিজ্ঞান (Jurisprudence) হল কর্তব্যের এক ব্যবস্থা যা মানুষকে, তার ইচ্ছাকে অপরের ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণে আনে স্বাধীনতার নীতি অনুসারে। আইন হল সেই আদেশ যা আমাদের সামাজিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রিত করে, নিজের স্বাধীনতার জন্য যতটা প্রয়োজন তার বাইরে হস্তক্ষেপ থেকে আমাদের বিরত রাখে। নীতি হল সেই কর্তব্যবোধ যা নিজের ইচ্ছা বা চেতনার দ্বারা পরিচালিত।** আসলে আইন ও নীতি, বৃহত্তর অর্থে দুটিই নীতির এলাকায় পড়ে। কর্তব্য সচেতনতাই উভয়ের সীমারেখা ছিন্ন করে। আইন বাইরের কাজ, নীতি অন্তরের আবেদন। কান্ট-এর বিশ্বাস বাইরের কাজ হলেও আইনের ক্ষেত্রেও অন্তরের টান আছে। কান্ট মনে করেন আইন কতটা মানুষের সুখবর্ধন করে সেটাই তার নির্ণায়ক নয়, আইনের আসল কথা হল তা যুক্তির সঙ্গে কতটা সংগতিসম্পন্ন।

কান্ট আইনকে দুভাগে ভাগ করেন—ব্যক্তিগত আইন ও সাধারণ আইন। ব্যক্তিগত আইন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীব হিসাবে লোকেদের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত করে। ব্যক্তিগত আইন বৈষয়িক ভোগ-সুখের প্রশ্নে, ব্যক্তিগত ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার প্রশ্নে কার্যকর। ব্যক্তির দ্রব্যের উপর মালিকানার অধিকার থাকতে পারে, কিন্তু তা চুক্তি নির্ভর। কান্ট ভূমিদাস প্রথা, জমিদারি প্রথার বিরোধী ছিলেন। সাধারণ আইন বলতে কান্ট বুঝেছেন সেইসব আইন যা ব্যক্তির নাগরিক হিসাবে ব্যক্তিবর্গের সম্পর্ক, বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিকের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করে। কান্ট-এর কাছে আইন গুরুত্ব পেয়েছে স্বাধীনতার মূল্যে। কান্ট স্বাধীনতার এক সর্বজনীন আইনে বিশ্বাসী ছিলেন। স্বাধীনতার এই সর্বজনীন আইন অনুসারেই আইন বিভিন্ন মানুষের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কার্যাবলিকে সমন্বিত করবে।

কান্ট জনসাধারণকেই (Volk) সার্বভৌম এবং সর্বোচ্চ আইনপ্রণেতা হিসাবে মনে করেন এবং রুশোর মতোই সাধারণের ইচ্ছাকে আইনের উৎস হিসাবে গ্রহণ করেন। রুশোর দৃষ্টি নিয়েই তিনি মানুষকে স্বাধীন এবং সমান হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চান। মানুষ কীভাবে সংবিধানের কল্যাণে জনতা (Menge) থেকে জনসাধারণে (Volk) পরিণত হয় সে কথা কান্ট বলেন। **কান্ট মনে করেন মানুষের স্বাধীনতার দুটি দিক—নেতিবাচক ও ইতিবাচক। নেতিবাচক অর্থে স্বাধীনতা হল মানুষের সেই কার্যকলাপ যার পেছনে কামনা-বাসনার নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। ইতিবাচক স্বাধীনতা হল নৈতিকতা মেনে, নীতির অনুজ্ঞা মেনে যে স্বাধীনতা মানুষ ভোগ করে।** তাঁর 'Freedom and Practice'-এ কান্ট একের স্বাধীন কার্যকলাপ ও সুখের সঙ্গে অপরের স্বাধীন কার্যকলাপ ও সুখকে মেলাবার কথা বলেছেন। 'Metaphysics Morals'-এ স্বাধীনতা বলতে কান্ট আইনের প্রতি আনুগত্যের কথা বলেছেন, আইন মেনে আচরণ করার কথা বলেছেন।

কান্ট রাষ্ট্রকে মানুষের সর্বোচ্চ লক্ষ্য হিসাবেই প্রতিষ্ঠা করেছেন। তবে কান্ট-এর যুগে রাষ্ট্রের তেমন তাৎপর্য ছিল না বলেই হয়তো তিনি রাষ্ট্রকে শেষ পর্যন্ত এই দৃষ্টিতে দেখেননি। **'*Metaphysics of Morals*' গ্রন্থে রাষ্ট্র বলতে তিনি বুঝেছেন 'আইনের অধীনে বহু মানুষের সংগঠন'। অন্যান্য সংগঠনের মতোই সমাজ তার লক্ষ্য নির্ধারণে রাষ্ট্রের সৃষ্টি করেছে।** কান্ট-এর চোখে 'State is a postulate of reason, not the incarnation of the national forces of a people.' কান্ট রাষ্ট্রকে উপযোগবাদীদের মতো অস্বীকার করতে চাননি। তাঁর চোখে রাষ্ট্র সবসময়ই প্রয়োজনীয়; মানুষের স্বাধীনতার জন্যই রাষ্ট্রের প্রয়োজন আছে। রাষ্ট্র চুক্তিরই ফল। রুশোর মতোই কান্ট বলেন মানুষ রাষ্ট্র গঠন করে জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করেছে তাঁর অধিকার সুনিশ্চিত করতে।

রাষ্ট্রের সংগঠন প্রসঙ্গে কান্ট মঁতেস্কু ও রুশোর মাঝামাঝি অবস্থান করেন। রুশোর মতো সার্বভৌমিকতা তিনি অর্পণ করেন জনসাধারণের হাতে। সমবেত মানুষের হাতেই তিনি চূড়ান্ত ক্ষমতা দেন এবং রাজাকে করেন তাদের প্রতিনিধি। মঁতেস্কুর মতে তিনি শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগ—সরকারের তিনটি বিভাগের কথা বলেন এবং ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণের কথা বলেন। আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা শুধু জনসাধারণের হাতেই থাকবে এবং এর ফলে অন্যায় ও অবিচার হবার সম্ভাবনা থাকবে না (কান্ট-এর কথায় "it is only the united and consenting will of all the people that ought to have the power of enacting law in the state.")। কান্ট-এর মতে স্বৈরতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্র রাষ্ট্রের তিনটি রূপ; আর সরকার দু-ধরনের—প্রজাতান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক। কান্ট মনে করেন সেই সরকার শ্রেষ্ঠ যা জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে; রাজা বা অভিজাত যে-ই সরকারে থাকুক জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব না করলে তার কোনো মূল্য নেই। **কান্ট চেয়েছেন 'Kingdom of Humanity', যে রাষ্ট্র মানুষের স্বাধীনতার বাধা অপসারণ করবে, শৃঙ্খলার সামাজিক অবস্থা সৃষ্টি করবে, মানবিক নৈতিকতার প্রসারে সাহায্য করবে সেই রাষ্ট্র শ্রেষ্ঠ।**

কান্ট-এর রাষ্ট্রচিন্তার মূল্যায়ন (An Assessment of Kant's Political Thought) : যে অর্থে ম্যাকিয়াভেলি, হবস, লক, মঁতেস্কু, রুশো, বেন্থাম বা জন স্টুয়ার্ট মিলকে রাষ্ট্রচিন্তাবিদ বলা যায় ঠিক সেই অর্থে কান্টকে রাষ্ট্রচিন্তাবিদ বলা যায় না। কান্ট প্রধানত দার্শনিক ও নীতিবিদ। রাজনীতিকে তিনি দর্শন ও নীতির অধীনে রেখেই আলোচনা করেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞান তাঁর কাছে কোনো স্বাধীন বিজ্ঞান হিসাবে আসেনি, এসেছে নির্ভরশীল উপাদান হিসাবে। মানবতাকে যদি রাজনীতির লক্ষ্য হিসাবে ধরা যায় তবে অবশ্যই কান্ট-এর রাজনীতি মূল্যবান। কারণ মানুষের সার্বিক স্বার্থ, মানবিকতার স্বার্থ তাঁর কাছে মূল্য পেয়েছে। মানুষের মুক্তি, সমানাধিকার, সহযোগিতা ও সম্প্রীতির কথাই এসেছে তাঁর তত্ত্বে। উদার ভাবনার বিকাশে কান্ট-এর অবদান গুরুত্বপূর্ণ। গেটেল যথার্থই বলেছেন, "The adoption of the Kantian philosophy throughout Germany did much to promote liberal ideas and to stimulate efforts to secure representative institutions and national unity."[১৪] কান্ট-এর চিন্তার সবচেয়ে বড়ো তাৎপর্য তিনি রাষ্ট্রকে আইনের শাসনের অনুগত করতে চেয়েছেন। রাষ্ট্র শুধুমাত্র একটি আইনি প্রতিষ্ঠান নয়, তার চেয়েও বেশি কিছু অর্থাৎ রাষ্ট্র একটি নৈতিক, মানবিক প্রতিষ্ঠান এ কথাও বলেছেন তিনি। কান্ট-এর তত্ত্বের আরেকটি দিক হল বিপ্লবের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা। স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অপগুণ থেকে মুক্তি ও মধ্যবিত্তের আলোকপ্রাপ্তির স্বার্থেই বিপ্লবকে স্বাগত

জানিয়েছেন তিনি। কান্টকে 'philosopher of altruism' 'mediator between the political thought of the cosmopolitan brand and humanitarian ideal of the classical era.' বলেও অভিহিত করা হয়েছে।

কান্ট-এর চিন্তার গুণগত মান বা উৎকর্ষ নিয়ে প্রশ্ন নেই। তবে তাঁর চিন্তার দুর্বলতাগুলিও প্রকট। তাঁর সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা হল রাজনীতি চিন্তায় তাঁর কোনো মৌলিক অবদান নেই। রুশো বা মঁতেস্কুর চিন্তাকেই তিনি নিজের মতো করে প্রকাশ করেছেন। তাত্ত্বিক বা নৈতিক দিকে তাঁর যতটা নজর রাজনীতির ব্যাবহারিক দিকে ততটা নজর নেই।

কান্ট-এর চিন্তার আর একটি প্রবণতা তাঁর সংশয়বাদ। কান্ট-এর সংশয়ের কথা বলতে গিয়ে ডানিং লিখেছেন, কান্ট জনসাধারণের হাতে চূড়ান্ত আইনসংক্রান্ত ক্ষমতা ন্যস্ত করেছেন আবার জনগণের শাসকের জন্যও জায়গা রেখেছেন। এই শাসক জনগণের হয়ে আইন করবেন, কিন্তু শাসন চালাবেন না। এই শাসকের অধিকার থাকবে অথচ কর্তব্য থাকবে না। সংবিধান লঙ্ঘন করলেও এর বিরুদ্ধে কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। এই আইনগত প্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। জনতার বিপ্লবকে কান্ট অগ্রাহ্য করেন, শাসক ছাড়া অন্য কেউ সংবিধান পরিবর্তন করবে তা তিনি চান না। জনসাধারণকে সর্বোচ্চ ক্ষমতা দান করেও সর্বোচ্চ শাসক বিষয়ে তাদের খোঁজখবর করার অধিকার তিনি দেননি। কান্ট-এর চিন্তার বৈপরীত্য সম্পর্কে অ্যারিস লিখেছেন-"This is all the more strange, as Kant himself admits that the revolutionary of today might be the law-giver of tomorrow. Besides he himself had hailed the French Revolution as a mark of the progress of mankind." [১৫] কান্ট-এর চিন্তায় তাত্ত্বিক লক্ষ্যের সঙ্গে বাস্তবের কোনো সংগতি নেই।

কান্ট সম্পর্কে আরো একটি অভিযোগ তাঁর চিন্তা শ্রেণি পক্ষপাতমুক্ত নয়। তিনি ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি। শাসকের স্বৈরাচার থেকে তিনি সাধারণ মানুষকে নয়, নিজের শ্রেণিকে মুক্ত করতে চেয়েছেন। রাষ্ট্র আইনের শাসনের অধীন এ কথা বলে তিনি তাঁর শ্রেণির পৌর অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকারকেই নিরাপদ করতে চেয়েছেন। স্বাধীনতা বা সমানাধিকার সম্পর্কে তার বক্তব্য কতটা সাধারণ মানুষের পক্ষে বা কতটা আনুষ্ঠানিক এ সম্পর্কে সন্দেহ থেকেই যায়। অ্যারিস লিখেছেন—"Kant was so much steeped in the idea of the absolutist state that he does not carry out the notion of equality. The principle of equality is not valid for all, but only for the economically independent male citizens, such as land owners, free farmers, artisans, merchants, learned men and officials."[১৬] রুশো প্রচলিত আর্থিক অনাচার ও অসাম্য সম্পর্কে যতটা সোচ্চার ছিলেন, কান্ট-এর মধ্যে তা অনুপস্থিত। কান্ট প্রচলিত সামাজিক বিন্যাসকে মেনে নিয়েছেন এবং তাকে যতটা সম্ভব মধ্যবিত্ত শ্রেণির পথে পরিচালিত করতে চেয়েছেন। সম্পত্তির সামাজিক মালিকানা বা শোষণের অবসান সম্পর্কে কোনো কিছু বলা কান্ট-এর পক্ষে কখনও সম্ভব হয়নি। এ কথা ঠিক ভূমিদাস প্রথাকে কান্ট মেনে নিতে পারেননি, কিন্তু সমাজের আর্থিক বৈষম্য নিয়ে কোনো কথা তিনি বলেননি বা এর সংস্কারের পক্ষে তেমন কোনো সুপারিশ করেননি।

কান্টকে কোনো কোনো লেখক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী বলেও উল্লেখ করেছেন। ব্যক্তি বা নীতিকেই তিনি আদর্শ মেনেছেন, রাষ্ট্রকে নয়। ব্যক্তির ইচ্ছা, স্বাতন্ত্র্যের উপর তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন এ কথা ঠিক, কিন্তু রাষ্ট্র বা আইনকে তিনি সমান মর্যাদা দিয়েছেন। ব্যক্তির প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল এ কথা ঠিক, কিন্তু রাষ্ট্র সম্পর্কেও তাঁর গভীর আস্থা ছিল। আইনের সঙ্গে স্বাধীনতা, রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির সাযুজ্য বিধান করাই তাঁর প্রধান কৃতিত্ব। কান্ট চেয়েছেন রাষ্ট্র হোক এমন যা ব্যক্তিকে আলোকিত করতে পারে, শাসক হোন এমন যিনি তাঁর উদারতার গুণে নাগরিককে অধীনে রাখতে পারেন, নাগরিক হোক এমন যে সবার সঙ্গে মিলেমিশে, সবার অধিকার মেনে নিয়ে থাকতে পারে। **কান্ট চেয়েছেন আলোকপ্রাপ্ত শাসক, স্বাধীন ও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিক, প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং শান্তি ও সহযোগিতার ভিত্তিতে গঠিত এক রাষ্ট্রসংঘ।**

কান্ট-এর উদ্যোগে যে জার্মান দর্শন প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত হয় তার আবেদন শুধু বুর্জোয়া সাহিত্যেই নয় মার্কসীয় সাহিত্যেও যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষ করা যায়। মার্কসবাদের তিনটি উৎসের অন্যতম যে জার্মান দর্শন সে বিষয়ে লেনিন

আমাদের অবহিত করেছেন। কান্ট বা হেগেলের প্রভাব মার্কস বা এঙ্গেলসের মতো জার্মান সমাজতন্ত্রীদের উপর কিছুটা হলেও যে পড়ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কান্টকে সমাজতন্ত্রের নীতিশাস্ত্রীয় মতবাদের প্রবক্তা বলে উল্লেখ করেছেন কেউ কেউ। সমাজতন্ত্রকে কান্ট কতটা আলোকিত করেছেন সে নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে, কিন্তু বুর্জোয়া ব্যবস্থার মধ্যে সমাজতন্ত্রকে নিয়ে আসা এবং এই সমাজতান্ত্রিক ভাবনা দিয়ে বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে পরিশোধনের কাজটি কান্ট-এর মাধ্যমে যে ভালোভাবেই সম্পন্ন হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।